

কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে ব্যাভিচার ও সমকামিতার ভয়াবহ পরিণতি

বিভাগ/অধ্যায়ঃ লজ্জাস্থান রক্ষার পথে একান্ত বাধাসমূহ

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইসলামহাউজ.কম

১০. যত্রতত্র চোখের দৃষ্টি ক্ষেপন:

দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে পুরুষরা যেমন আদর্শ তেমনিভাবে মহিলারাও। কোনো যুবক-যুবতী যদি চরিত্রহীন বা চরিত্রহীনা হয়ে থাকে তা হলে এর মূলে রয়েছে যত্রতত্র দৃষ্টি ক্ষেপন।

এ ছাড়াও যৌনাঙ্গ রক্ষার পেছনে বাধা হিসেবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকেও গণ্য করা হয়:

যৌনকর্ম সম্পর্কীয় আলোচনা, গানের নেশা, খারাপ উপন্যাস ও খারাপ কবিতা পড়ার নেশা, শয়তানের কুমন্ত্রণার কাছে হার মানা, কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ, দীর্ঘ আশা ও দুনিয়ার ভালোবাসা, নিয়ন্ত্রণহীন সুখভোগ এবং সন্তানদের প্রতি অভিভাবকদের লাগাতার অবহেলা ইত্যাদি ইত্যাদি।

আল্লাহ তা‘আলা শুধু যৌনকর্মকেই হারাম করেননি, বরং তিনি এরই পাশাপাশি সব ধরনের অশ্লীলতাকেও হারাম করেছেন।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأَبْغَاثَ بِغْيَاثِ الْغَاثِ وَالْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنْزَلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٣٣﴾ [الاعراف: ٣٣]

“(হে মুহাম্মাদ) তুমি ঘোষণা করে দাও, নিশ্চয় আমার প্রভু হারাম করে দিয়েছেন প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল ধরনের অশ্লীলতা, পাপকর্ম, অন্যায় বিদ্রোহ, আল্লাহ তা‘আলার সাথে কাউকে শরীক করা; যে ব্যাপারে তিনি কোনো দলীল-প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহ তা‘আলা সম্পর্কে অজ্ঞতাবশত কিছু বলা”। [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ৩৩]

আল্লাহ তা‘আলা যখন ব্যাভিচারকর্মকে নিষেধ করে দিয়েছেন তখন তিনি সে সকল পথকেও নীতিগতভাবে রোধ করে দিয়েছেন যেগুলোর মাধ্যমে স্বভাবতঃ ব্যাভিচারকর্ম সংঘটিত হয়ে থাকে। এ জন্যই আল্লাহ তা‘আলা পুরুষ ও মহিলা উভয় জাতিকে লজ্জাস্থান হিফায়তের পূর্বে সর্বপ্রথম নিজ দৃষ্টিকে সংযত করতে আদেশ করেন।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿قُلْ لِلَّهِ مَوَدَّةٌ مِّنْ مَّنْ يَّغُضُّوْنَ مِنْ أَهْلِ صَرْفِهِمْ ۚ وَبَدَّ فَعُظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ٣٠ وَقُلْ لِلَّهِ مَوَدَّةٌ مِّنْ مَّنْ يَّغُضُّونَ ۚ مِنْ أَهْلِ صَرْفِهِمْ ۚ وَبَدَّ فَعُظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ﴾ [النور: ৩০, ৩১]

“(হে মুহাম্মাদ) তুমি মুমিনদেরকে বলে দাওঃ যেন তারা নিজ দৃষ্টিকে সংযত করে এবং নিজ লজ্জাস্থানকে হিফায়ত করে। এটাই তাদের জন্য প্রবিত্র থাকার সর্বোত্তম মাধ্যম। নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা তাদের কর্ম সম্পর্কে অধিক অবগত। তেমনিভাবে তুমি মুমিন মহিলাদেরকেও বলে দাওঃ যেন তারা নিজ দৃষ্টিকে সংযত করে এবং নিজ

লজ্জাস্থানকে হিফায়ত করে”। [সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩০-৩১]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ۝﴾ [গাফির: ১৯]

“তিনিই চক্ষুর অপব্যবহার এবং অন্তরের গোপন বস্তু সম্পর্কেও অবগত”। [সূরা গাফির, আয়াত: ১৯]

আল্লাহ তা‘আলা কাউকে অন্য কারোর ঘরে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন। যাতে চক্ষুর অপব্যবহার না হয় এবং তা সম্পূর্ণরূপে রক্ষা পায়।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ ۖ حَتَّى تَسْأَلُوا نِسَاءَهُنَّ عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝ ٢٧ فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ ۚ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ٱرْجِعُوا فَٱرْجِعُوا ۚ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾ [النور: ২৮, ২৭]

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ছাড়া অন্য কারো গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না নিয়ে এবং তাদেরকে সালাম না করে প্রবেশ করো না। এটাই তো তোমাদের জন্য অনেক শ্রেয়। আশাতো তোমরা উক্ত উপদেশ গ্রহণ করবে। আর যদি তোমরা উক্ত গৃহে কাউকে না পাও তা হলে তোমরা তাতে একেবারেই প্রবেশ করো না যতক্ষণ না তোমাদেরকে তাতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। যদি তোমাদেরকে বলা হয় যে, ফিরে যাও, তাহলে তোমরা ফিরে যাবে। এটাই তো তোমাদের জন্য পবিত্র থাকার সর্বোত্তম মাধ্যম। আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের কর্ম সম্পর্কে বিশেষভাবে অবগত”। [সূরা আন-নূর: ২৭-২৮]

আল্লাহ তা‘আলা বিশেষভাবে মহিলাদেরকে অপর পুরুষ থেকে পর্দা করতে আদেশ করেছেন। যাতে পুরুষের লোভাতুর দৃষ্টি তার অপূর্ব সৌন্দর্যের উগ্র আকর্ষণ থেকে রক্ষা পায় এবং ক্রমান্বয়ে সে ব্যভিচারের দিকে ধাবিত না হয়।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۚ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ بِخُمْرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۚ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ ۚ وَالَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ ۚ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۚ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝﴾ [النور: ৩১]

“মহিলারা যেন তাদের সৌন্দর্য (শরীরের সাথে এঁটে থাকা অলংকার বা আকর্ষণীয় পোষাক) প্রকাশ না করে। তবে যা স্বভাবতই প্রকাশ পেয়ে যায় (বোরকা, চাদর, মোজা ইত্যাদি) তা প্রকাশ পেলে কোনো অসুবিধে নেই। তারা যেন তাদের ঘাড়, গলা ও বক্ষদেশ (চেহারা সহ) মাথার ওড়না দিয়ে আবৃত রাখে। তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, নিজের ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাইপো, বোনপো, স্বজাতীয় মহিলা, মালিকানাধীন দাস, যৌন কামনা রহিত অধীন পুরুষ, নারীদের গোপনাস্ত সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া অন্য কারো নিকট নিজ সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তেমনিভাবে তারা যেন সজোরে ভূমিতে নিজ পদযুগল ক্ষেপণ না করে। কারণ, তাতে করে তাদের

আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য প্রকাশ পাবে, বরং হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহ তা‘আলার দিকে প্রত্যাবর্তন করো। তখনই তোমরা সফলকাম হতে পারবে”। [সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩১]

কোনো ব্যক্তি চারটি অঙ্গকে সঠিক ও শরী‘আত সম্মতভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেই সত্যিকারার্থে সে অনেকগুলো গোনাহ বিশেষভাবে ব্যাভিচার থেকে রক্ষা পেতে পারে। তেমনিভাবে তার ধার্মিকতাও অনেকাংশে রক্ষা পাবে। আর তা হচ্ছে:

১. চোখ ও দৃষ্টিশক্তি। তা রক্ষা করা লজ্জাস্থানকে রক্ষা করার শামিল।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«غُضُّوا أَبْصَارَكُمْ ، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ»

“তোমাদের চোখ নিম্নগামী করো এবং লজ্জাস্থান হিফায়ত করো”।[1]

হঠাৎ কোনো হারাম বস্তুর উপর চোখ পড়ে গেলে তা তড়িঘড়ি ফিরিয়ে নিতে হবে। দ্বিতীয়বার কিংবা একদৃষ্টে ওদিকে তাকিয়ে থাকা যাবে না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

يَا عَلِيُّ! لَا تَتَّبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ ، فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى ، وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ

“হে ‘আলী! বার বার দৃষ্টি ক্ষেপণ করো না। কারণ, হঠাৎ দৃষ্টিতে তোমার কোনো দোষ নেই। তবে ইচ্ছাকৃত দ্বিতীয় দৃষ্টি অবশ্যই দোষের”।[2]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হারাম দৃষ্টিকে চোখের যিনা বলে আখ্যায়িত করেছেন। যেমনিভাবে কোনো ব্যক্তির হাত, পা, মুখ, কান, মনও ব্যাভিচার করে থাকে। তবে মারাত্মক ব্যাভিচার হচ্ছে লজ্জাস্থানের ব্যাভিচার। যাকে বাস্তবার্থেই ব্যাভিচার বলা হয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزَّيْنَةِ ، أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ ، فَرِزْنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظْرَ ، وَزَيْنَا اللِّسَانَ الْمَنْطِقَ ، وَالْيَدَيْنِ تَزَيْنَانِ فَرِزْنَاهُمَا الْبَطْشُ ، وَالرَّجْلَانِ تَزَيْنَانِ فَرِزْنَاهُمَا الْمَشْيُ ، وَالْفَمَ يَزْنِي فَرِزْنَاهُ الْقَبْلُ ، وَالْأُذُنُ زَيْنَاهَا الْاسْتِمَاعُ ، وَالنَّفْسُ تَمْنَى وَتَشْتَهِي ، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ وَيُكَذِّبُهُ»

“নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা প্রত্যেক আদম সন্তানের জন্য যিনার কিছু অংশ বরাদ্দ করে রেখেছেন। যা সে অবশ্যই করবে। চোখের যিনা হচ্ছে অবৈধভাবে কারোর দিকে দৃষ্টি ক্ষেপণ, মুখের যিনা হচ্ছে অশ্লীল কথোপকথন, হাতও ব্যাভিচার করে, তবে তার ব্যাভিচার হচ্ছে অবৈধভাবে কাউকে হাত দিয়ে ধরা, পাও ব্যাভিচার করে। তবে তার ব্যাভিচার হচ্ছে কোনো ব্যাভিচার সংঘটনের জন্য রওয়ানা করা, মুখও ব্যাভিচার করে। তবে তার ব্যাভিচার হচ্ছে অবৈধভাবে কাউকে চুমু দেওয়া, কানের ব্যাভিচার হচ্ছে অশ্লীল কথা শ্রবণ করা, মনও ব্যাভিচারের কামনা-বাসনা করে। আর তখনই লজ্জাস্থান তা বাস্তবায়িত করে অথবা করে না”।[3]

দৃষ্টিই সকল অঘটনের মূল। কারণ, কোনো কিছু দেখার পরই তো তা মনে জাগে। মনে জাগলে তার প্রতি চিন্তা আসে। চিন্তা আসলে অন্তরে তাকে পাওয়ার কামনা-বাসনা জন্মে। কামনা-বাসনা জন্মিলে তাকে পাওয়ার খুব ইচ্ছে হয়। দীর্ঘ দিনের ইচ্ছে প্রতিজ্ঞার রূপ ধারণ করে। আর তখনই কোনো কর্ম সংঘটিত হয়। যদি পথিমধ্যে কোনো

ধরনের বাধা না থাকে।

দৃষ্টির কুফল হচ্ছে আফসোস, উর্ধ্বশ্বাস ও অন্তরজ্বালা। কারণ, মানুষ যা চায় তার সবটুকু সে কখনোই পায় না। আর তখনই তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে।

অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে এই যে, দৃষ্টি হচ্ছে তীরের ন্যায়।

অন্তরকে নাড়া দিয়েই তা লক্ষ্যবস্তুতে পৌঁছায়। একেবারে শান্তভাবে নয়।

আরো আশ্চর্যের কাহিনী এই যে, দৃষ্টি অন্তরকে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। আর এ ক্ষতের ওপর অন্য ক্ষত (আবার তাকানো) সামান্যটুকু হলেও আরামপ্রদ। যার নিশ্চিত নিরাময় কখনোই সম্ভবপর নয়।

২. মন ও মনোভাব। এ পর্যায় খুবই কঠিন। কারণ, মানুষের মনই হচ্ছে ন্যায়-অন্যায়ের একমাত্র উৎস। মানুষের ইচ্ছা, স্পৃহা, আশা ও প্রতিজ্ঞা মনেরই সৃষ্টি। সুতরাং যে ব্যক্তি নিজ মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে সে নিজ কু-প্রবৃত্তির ওপর বিজয় লাভ করবে। আর যে ব্যক্তি নিজ মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না নিশ্চিতভাবে সে কুপ্রবৃত্তির শিকার হবে। পরিশেষে তার ধ্বংস একেবারেই অনিবার্য।

মানুষের মনোভাবই পরিশেষে দুরাশার রূপ নেয়। মনের দিক থেকে সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তি সে যে দুরাশায় সম্ভুষ্ট। কারণ, দুরাশাই হচ্ছে সকল ধরনের আলস্য ও বেকারত্বের পুঁজি। এটিই পরিশেষে লজ্জা ও আফসোসের মূল কারণ হয়ে দাঁড়ায়। দুরাশাগ্রস্ত ব্যক্তি আলস্যের কারণে যখন বাস্তবতায় পৌঁছুতে পারে না তখনই তাকে শুধু আশার ওপরই নির্ভর করতে হয়। মূলতঃ বাস্তববাদী হওয়াই একমাত্র সাহসীর পরিচয়।

মানুষের ভালো মনোভাব আবার চার প্রকার:

১. দুনিয়ার লাভার্জনের মনোভাব।
২. দুনিয়ার ক্ষতি থেকে বাঁচার মনোভাব।
৩. আখিরাতের লাভার্জনের মনোভাব।
৪. আখিরাতের ক্ষতি থেকে বাঁচার মনোভাব।

নিজ মনোভাবকে উক্ত চারের মধ্যে সীমিত রাখাই যে কোনো মানুষের একান্ত কর্তব্য। এগুলোর যে কোনটিই মনে জাগ্রত হলে তা অতি তাড়াতাড়ি কাজে লাগানো উচিত। আর যখন এগুলোর সব কটিই মনের মাঝে একত্রে জাগ্রত হয় তখন সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণটিকেই প্রাধান্য দিতে হবে। যা এখনই না করলে পরে করা সম্ভবপর হবে না।

কখনো এমন হয় যে, অন্তরে একটি প্রয়োজনীয় কাজের মনোভাব জাগ্রত হলো যা পরে করলেও চলে অথচ এরই পাশাপাশি আরেকটি এমন কাজের মনোভাবও অন্তরে জন্মালো যা এখনই করতে হবে। না করলে তা পরবর্তীতে কখনোই করা সম্ভবপর হবে না। এ ক্ষেত্রে আপনাকে প্রয়োজনীয় বস্তুটিকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে। কেউ কেউ অপরটিকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন যা শরী‘আতের মৌলিক নীতি পরিপন্থী।

তবে সর্বোৎকৃষ্ট চিন্তা ও মনোভাব সেটিই যা একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার সম্ভৃষ্টি কিংবা পরকালের জন্যই হবে। এ ছাড়া যত চিন্তা-ভাবনা রয়েছে তা হচ্ছে শয়তানের ওয়াসওয়াসা অথবা ভ্রান্ত আশা।

যে চিন্তা-ফিকির একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার জন্য তা আবার কয়েক প্রকার:

১. কুরআন মাজীদে আয়াতসমূহ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা এবং তাতে নিহিত আল্লাহ তা‘আলার মূল উদ্দেশ্য বুঝতে

চেষ্টা করা।

২. দুনিয়াতে আল্লাহ তা‘আলার যে প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহ রয়েছে তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। এরই মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলার নাম ও গুণাবলী, কৌশল ও প্রজ্ঞা, দান ও অনুগ্রহ বুঝতে চেষ্টা করবে। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা‘আলা এ ব্যাপারে মানুষকে মনোনিবেশ করার জন্য উৎসাহ প্রদান করেছেন।

৩. মানুষের ওপর আল্লাহ তা‘আলার যে অপার অনুগ্রহ রয়েছে তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা। তাঁর দয়া, ক্ষমা ও ধৈর্য নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা।

উক্ত ভাবনাসমূহ মানুষের অন্তরে আল্লাহ তা‘আলার একান্ত পরিচয়, ভয়, আশা ও ভালোবাসার জন্ম দেয়।

৪. নিজ অন্তর ও আমলের দোষ-ত্রুটি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা। এরূপ চিন্তা-চেতনা খুবই কল্যাণকর, বরং একে সকল কল্যাণের সোপানই বলা চলে।

৫. সময়ের প্রয়োজন ও নিজ দায়িত্ব নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা। সত্যিকার ব্যক্তি তো সেই যে নিজ সময়ের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

ইমাম শাফে‘ঈ রহ. বলেন, আমি সূফীদের নিকট মাত্র দু’টি ভালো কথাই পেয়েছি। যা হচ্ছে: তারা বলে থাকে, সময় তলোয়ারের ন্যায়। তুমি তাকে ভালো কাজে নিঃশেষ করবে। নতুবা সে তোমাকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত করবে। তারা আরো বলে, তুমি অন্তরকে ভালো কাজে লাগাবে। নতুবা সে তোমাকে খারাপ কাজেই লাগাবে।

মনে কোনো চিন্তা-ভাবনার উদ্বেক তা ভালো অথবা খারাপ যাই হোক না কেন দোষের নয়। বরং দোষ হচ্ছে খারাপ চিন্তা-চেতনাকে মনের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ স্থান দেওয়া। কারণ, আল্লাহ তা‘আলা মানুষকে দু’টি চেতনা তথা প্রবৃত্তি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। যার একটি ভালো অপরটি খারাপ। একটি সর্বদা একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টিই কামনা করে। পক্ষান্তরে অন্যটি গায়রুল্লাহ্’র সন্তুষ্টিই কামনা করে। ভালোটি অন্তরের ডানে অবস্থিত যা ফেরেশতা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। অপরটি অন্তরের বামে অবস্থিত যা শয়তান কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। পরস্পরের মধ্যে সর্বদা যুদ্ধ ও সংঘর্ষ অব্যাহত। কখনো এর জয় আবার কখনো ওর জয়। তবে সত্যিকারের বিজয় ধারাবাহিক ধৈর্য, সতর্কতা ও আল্লাহ্‌ভীরুতার ওপরই নির্ভরশীল।

অন্তরকে কখনো খালি রাখা যাবে না। ভালো চিন্তা-চেতনা দিয়ে ওকে ভর্তি রাখতেই হবে। নতুবা খারাপ চিন্তা-চেতনা তাতে অবস্থান নিবেই। সূফীবাদীরা অন্তরকে কাশেফর জন্য খালি রাখে বিধায় শয়তান সুযোগ পেয়ে তাতে ভালোর বেশে খারাপের বীজ বপন করে। সুতরাং অন্তরকে সর্বদা ধর্মীয় জ্ঞান ও হিদায়াতের উপকরণ দিয়ে ভর্তি রাখতেই হবে।

৩. মুখ ও বচন। কখনো অযথা কথা বলা যাবে না। অন্তরে কথা বলার ইচ্ছা জাগলেই চিন্তা করতে হবে, এতে কোনো ফায়দা আছে কি না? যদি তাতে কোনো ধরনের ফায়দা না থাকে তা হলে সে কথা কখনো বলবে না। আর যদি তাতে কোনো ধরনের ফায়দা থেকে থাকে তাহলে দেখবে, এর চাইতে আরো লাভজনক কোনো কথা আছে কি না? যদি থেকে থাকে তাহলে তাই বলবে, অন্যটা নয়।

কারোর মনোভাব সরাসরি বুঝা অসম্ভব। তবে কথার মাধ্যমেই তার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে বুঝে নিতে হয়।

ইয়াহয়া ইবন মু‘আয রহ. বলেন, অন্তর হচ্ছে ডেগের ন্যায়। তাতে যা রয়েছে অথবা দেওয়া হয়েছে তাই রন্ধন হতে থাকবে। বাড়তি কিছু নয়। আর মুখ হচ্ছে চামচের ন্যায়। যখন কেউ কথা বলে তখন সে তার মনোভাবই

ব্যক্ত করে। অন্য কিছু নয়। যেভাবে আপনি কোনো পাত্রে রাখা খাদ্যের স্বাদ জিহ্বা দিয়ে অনুভব করতে পারেন ঠিক তেমনিভাবে কারোর মনোভাব আপনি তার কথার মাধ্যমেই টের পাবেন।

মন আপনার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নিয়ন্ত্রক ঠিকই। তবে সে আপনার কোনো না কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহযোগিতা ছাড়া যে কোনো কাজ সম্পাদন করতে পারে না। সুতরাং আপনার মন যদি আপনাকে কোনো খারাপ কথা বলতে বলে তখন আপনি আপনার জিহ্বার মাধ্যমে তার কোনো সহযোগিতা করবেন না। তখন সে নিজ কাজে ব্যর্থ হবে নিশ্চয় এবং আপনিও গুনাহ কিংবা তার অঘটন থেকে রেহাই পাবেন।

এ জন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لَا يَسْتَقِيمُ إِيْمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ ، وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ»

“কোনো বান্দার ঈমান ঠিক হয় না যতক্ষণ না তার অন্তর ঠিক হয়। তেমনিভাবে কোনো বান্দার অন্তর ঠিক হয় না যতক্ষণ না তার মুখ ঠিক হয়”।[4]

সাধারণত মন মুখ ও লজ্জাস্থানের মাধ্যমেই বেশি অঘটন ঘটায় তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো কোন জিনিস সাধারণতঃ মানুষকে বেশির ভাগ জাহান্নামের সম্মুখীন করে? তখন তিনি বলেন,

«الْفَمُّ وَالْفَرْجُ»

“মুখ ও লজ্জাস্থান”।[5]

একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মু‘আয ইবন জাবাল্ রাদিয়াল্লাহু আনহু কে জান্নাতে যাওয়া ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার সহযোগী আমল বলে দেওয়ার পর আরো কিছু ভালো আমলের কথা বলেন। এমনকি তিনি সকল ভালো কাজের মূল, কাণ্ড ও চূড়া সম্পর্কে বলার পর বলেন,

«أَلَا أُخْبِرُكَ بِمَلَكٍ ذَلِكَ كُلُّهُ؟! قُلْتُ: بَلَى يَا نَبِيَّ اللَّهِ! فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ ، قَالَ: كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! وَإِنَّا لَمُؤَاخِذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟! فَقَالَ: تَكَلُّتُكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ! وَهَلْ يَكُوبُ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ»

“আমি কি তোমাকে এমন বস্তু সম্পর্কে বলবো যার ওপর এ সবই নির্ভরশীল? আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! আপনি দয়া করে তা বলুন। অতঃপর তিনি নিজ জিহ্বা ধরে বললেন, এটাকে তুমি অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ করবে। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! আমাদেরকে কথার জন্যও কি পাকড়াও করা হবে? তিনি বললেন, তোমার কল্যাণ হোক! হে মু‘আয! একমাত্র কথার কারণেই বিশেষভাবে সে দিন মানুষকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে”।[6]

অনেক সময় একটিমাত্র কথাই মানুষের দুনিয়া ও আখিরাত এমনকি তার সকল নেক আমল ধ্বংস করে দেয়।

জুন্দাব ইবন ‘আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«قَالَ رَجُلٌ: وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لِفُلَانٍ ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لَا أُغْفِرَ لِفُلَانٍ ، فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ وَأُحْبَبْتُ عَمَلَكَ»

“জনৈক ব্যক্তি বললো, আল্লাহর কসম, আল্লাহ তা‘আলা ওকে ক্ষমা করবেন না। তখন আল্লাহ তা‘আলা বললেন,

কে সে? যে আমার ওপর কসম খেয়ে বলে যে, আমি ওমুককে ক্ষমা করবো না। অতএব, আল্লাহ তা‘আলা তাঁর ওপর শপথকারীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমি ওকেই ক্ষমা করে দিলাম এবং তোমার সকল নেক আমল ধ্বংস করে দিলাম”।[7]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু উক্ত হাদীস বর্ণনা করার পর বলেন,

«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَوْ بَقِيَتْ دُنْيَاهُ وَآخِرَتُهُ»

“সে সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন! লোকটি এমন কথাই বলেছে যা তার দুনিয়া ও আখিরাত সবই ধ্বংস করে দিয়েছে”।[8]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন,

«إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَّبِعُنُ مَا فِيهَا يَهْوِي بِهَا فِي النَّارِ أَوْ يَبْعَدُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ»

“বান্দা কখনো কখনো যাচাই বাছাই ছাড়াই এমন কথা বলে ফেলে যার দরুন সে জাহান্নামে এতদূর পর্যন্ত নিক্ষিপ্ত হয় যতদূর দুনিয়ার পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের মাঝের ব্যবধান”।[9]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন,

«وَأَنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، مَا يَطْنُ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغْتَ، فَيَكْتُبُ اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمٍ يَلْقَاهُ»

“তোমাদের কেউ কখনো এমন কথা বলে ফেলে যাতে আল্লাহ তা‘আলা তার ওপর অসন্তুষ্ট হন। সে কখনো ভাবতেই পারে নি কথাটি এমন এক মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছবে। অথচ আল্লাহ তা‘আলা উক্ত কথার দরুনই কিয়ামত পর্যন্ত তার ওপর তাঁর অসন্তুষ্টি অবধারিত করে ফেলেন”।[10]

উক্ত জটিলতার কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ উম্মতকে সর্বদা ভালো কথা বলা অথবা চুপ থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

«مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ»

“যার আল্লাহ তা‘আলা ও পরকালের ওপর বিশ্বাস রয়েছে সে যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে”।[11]

সালফে সালেহীনগণ আজকের দিনটা ঠাণ্ডা কিংবা গরম এ কথা বলতেও অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করতেন। এমনকি তাদের জনৈককে স্বপ্নে দেখার পর তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, আমাকে এখনো এ কথার জন্য আটকে রাখা হয়েছে যে, আমি একদা বলেছিলাম, আজ বৃষ্টির কতই না প্রয়োজন ছিলো! অতএব, আমাকে বলা হলো, তুমি এটা কীভাবে বুঝলে যে, আজ বৃষ্টির খুবই প্রয়োজন ছিলো; বরং আমিই আমার বান্দার কল্যাণ সম্পর্কে অধিক পরিজ্ঞাত।

অতএব, জানা গেলো, জিহ্বার কাজ খুবই সহজ। কিন্তু তার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ।

সবার জানা উচিত যে, আমাদের প্রতিটি কথাই লিপিবদ্ধ হচ্ছে। তা যতই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হোক না কেন।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿مَا يَلَّا فِظٌ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ [١٨: ١٨]

“মানুষ যাই বলুক না কেন তা লিপিবদ্ধ করার জন্য দু’জন তৎপর প্রহরী (ফিরিশতা) তার সাথেই রয়েছে”। [সূরা ক্রাফ, আয়াত: ১৮]

মানুষ তার জিস্সা সংক্রান্ত দু’টি সমস্যায় সর্বদা ভুগতে থাকে। একটি কথার সমস্যা। আর অপরটি চুপ থাকার সমস্যা। কারণ, অকথ্য উক্তিকারী গুনাহ্কার বক্তা শয়তান। আর সত্য কথা বলা থেকে বিরত ব্যক্তি গুনাহ্কার বোবা শয়তান।

৪. পদ ও পদক্ষেপ। অর্থাৎ সাওয়াবের কাজ ছাড়া অন্য কোনো কাজে পদক্ষেপণ করা যাবে না।

মনে রাখতে হবে যে, প্রতিটি জায়েয কাজ একমাত্র নিয়্যাতের কারণেই সাওয়াবে রূপান্তরিত হয়।

উক্ত দীর্ঘ আলোচনা থেকে আমরা সহজে এ কথাই বুঝতে পারলাম যে, কোনো ব্যক্তি তার চোখ, মন, মুখ ও পা সর্বদা নিজ নিয়ন্ত্রণে রাখলে তার থেকে কোনো গুনাহ বিশেষ করে ব্যাভিচার কর্মটি কখনো প্রকাশ পেতে পারে না। কারণ, দেখলেই তো ইচ্ছে হয়। আর ইচ্ছে হলেই তো তা মুখ খুলে বলতে মনে চায়। আর তখনই তা অধীর আগ্রহে পাওয়ার অপেক্ষায় থাকে।

বিচ্যুতি তথা স্থলন যখন দু’ধরনেরই তথা পায়ের ও মুখের তাই আল্লাহ তা‘আলা উভয়টিকে কুরআন মাজীদের মধ্যে একই সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْلِكُونَ عَلَى الْبَارِئِ هُوَ أَضْيَقُ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾ [الفرقان: ৬২]

“দয়ালু আল্লাহর বান্দা ওরাই যারা নম্রভাবে চলাফেরা করে এ পৃথিবীতে। মূর্খরা যখন তাদেরকে (তাচ্ছিল্যভরে) সম্বোধন করে তখন তারা বলে: তোমাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ! আমরা সবই সহ্য করে গেলাম; তোমাদের সঙ্গে আমাদের কোনো দ্বন্দ্ব নেই।” [সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ৬৩]

যেমনভাবে আল্লাহ তা‘আলা দেখা ও ভাবাকে একত্রে উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ [غافر: ১৯]

“তিনি চক্ষুর অপব্যবহার এবং অন্তরের গোপন বস্তু সম্পর্কেও অবগত”। [সূরা গাফির, আয়াত: ১৯]

>

ফুটনোট

[1] আহমদ: ৫/৩২৩; হাকিম: ৪/৩৫৮, ৩৫৯; ইবন হিব্বান, হাদীস নং ২৭১; বায়হাকী: ৬/২৮৮

[2] আবু দাউদ, হাদীস নং ২১৪৯; তিরমিযী, হাদীস নং ২৭৭৭; আহমদ: ৫/৩৫১, ৩৫৩, ৩৫৭; হাকিম: ২/১৯৪; বায়হাকী: ৭/৯০

[3] আবু দাউদ, হাদীস নং ২১৫২, ২১৫৩, ২১৫৪

[4] মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং ১৩০৪৮

[5] তিরমিযী, হাদীস নং ২০০৪; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৪৩২২; আহমদ: ২/২৯১, ৩৯২, ৪৪২; হাকিম: ৪/৩২৪; ইবন হিব্বান, হাদীস নং ৪৭৬; সহীহ বুখারী/আদাবুল মুফরাদ, হাদীস নং ২৯২; বায়হাকী/শু'আবুল ইমান, হাদীস নং ৪৫৭০

[6] তিরমিযী, হাদীস নং ২৬১৬; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৪০৪৪; আহমদ: ৫/২৩১, ২৩৭; আব্দু ইবন হুমাইদ/মুত্তাখাব, ১১২; আব্দুর রায়্যাক, হাদীস নং ২০৩০৩; বায়হাকী/শু'আবুল ইমান, হাদীস নং ৪৬০৭

[7] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬২১

[8] আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৯০১

[9] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৪৭৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৯৮৮

[10] তিরমিযী, হাদীস নং ২৩১৯; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৪০৪০; আহমদ ৩/৪৬৯; হাকিম ১/৪৪-৪৬; ইবন হিব্বান, হাদীস নং ২৮০; মালিক: ২/৯৮৫

[11] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬০১৮, ৬০১৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৭, ৪৮; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৪০৪২

Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=9569>

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন